নির্বাচনের আগে পোশাক খাত নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র

জাতীয় গার্মেন্টেস শ্রমিক ফেডারেশনের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নকল পণ্য রপ্তানি অভিযোগ একই সূত্রে গাঁথছেন ব্যবসায়ী নেতা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তারা বলছেন এটা নির্বাচনের আগে সরকারের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস।

রোববার পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা ঘোষণার দাবি জানায় জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। এসব দাবি আদায়ে মিছিল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রাসহ নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে সংগঠনটি। সমাবেশে শ্রৈমিক নেতারা জানান, ২০১৮ সালে পোশাকশ্রমিকদের জন্য ঘোষিত ৮ হাজার টাকা মজুরি ছিল ওই সময়ে ১০০ ডলারের সমান। বর্তমানে ১০০ ডলারের বাজারদর দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার টাকার বেশি। অন্যদিকে গত পাঁচ বছরে দেশে দ্রব্যমূল্য অনেক বেড়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা দু-তিন গুণ বেড়েছে। বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সমন্বয় করলে পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকার বেশি হওয়া উচিত।

নেতারা আরও বলেন, পোশাক কারখানার মালিকদের মুনাফা ৭ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত। এ ছাড়া মালিকেরা রপ্তানির বিপরীতে সরকারের কাছ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ প্রণোদনাও পান। এ বিষয়গুলোও মজুরি নির্ধারণে আমলে নেওয়া দরকার। প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক খাতের শ্রমিকদের মজুরি সর্বনিম্ন। পাশাপশি ৬৫ শতাংশ মূল মজুরি ও প্রতিবছর ১০ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধির দাবি করে সংগঠনটি। তাদের দাবির পক্ষে পোশাকের বৈশ্বিক ক্রেতাদেরও সহযোগিত্ওা চান শ্রমিকনেতারা।

শ্রমিকদের এই দাবি নিয়ে কথা বলেন, বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান । তিনি বলেন, “গত চার বছরে শ্রমিকদের বেতন বাড়ানো হয়নি এটা ঠিক নয়। সর্বশেষ মজুরি বোর্ড বেতন বাড়ানোর পর প্রতি বছরই তাদের শতকরা পাঁচ ভাগ হারে ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয়েছে। তারা এখন বেতন বাড়ানোর দাবি করছেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। অবশ্যই মালিকরা মজুরি বাড়াবে। তবে তা সক্ষমতার মধ্যে থাকতে হবে। পাশাপাশি ভাবতে হবে সদ্য করোনাত্তর পরিস্থিতির কথা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরেকজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী জানান, পোশাক খাতে ২০১৩ সালে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা ২০১০ সালে ৩০০০ টাকা ছিল, ২০০৬ সালে এটি ছিল ১৬৬২ দশমিক ৫০ টাকা, ১৯৯৪ সালে ৯৪০ টাকা এবং ১৯৮৫ সালে ছিল ৬২৭ টাকা। সেখান থেকে বের হয়ে এসেছে গার্মেন্টস খাত।

আগামী আগামী নভেম্বরের আগেই শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি নির্ধারণের লক্ষ্য রয়েছে মজুরি বোর্ডের। বেশিরভাগ পোশাক কারখানার মালিক মজুরি বাড়ানোর পক্ষে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সার্বিক অর্থনীতির যে অবস্থা সেখানে ন্যূনতম মজুরি ১২-১৩ হাজারের বেশি দেওয়া সম্ভব নয়। এরই মধ্যে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের দু'টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রম আইন অনুযায়ী, প্রতি পাঁচ বছর পর পর মজুরি কাঠামো পর্যালোচনা করতে হয়। সে হিসাবে এবছরই বাড়ছে মজুরি। এখন মজুরি নিয়ে বেশি চাপ সৃষ্টি করলে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গার্মেন্টেস মালিকরা আরও জানান, ২০১৯ সাল থেকে গার্মেন্টস এর ন্যূনতম মজুরি ৮০০০ পাচ্ছেন পোশাক শ্রমিকরা। এই খাতে বর্তমানে মজুরি প্রথম গ্রেডে ১৮ হাজার ২৫৭, দ্বিতীয় গ্রেডে ১৫ হাজার ৪১৬, তৃতীয় গ্রেডে ৯ হাজার ৮৪৫, চতুর্থ গ্রেডে ৯ হাজার ৩৪৭ ও পঞ্চম গ্রেডে ৮ হাজার ৮৭৫ টাকা। বেসরকারি খাতে একজন বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েটের বেতন শুরু হয় ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা। সেলস রিপ্রেসেন্টিটিভরা ১০ হাজার টাকা। এমনকি সরকারি চাকরির অনেক ক্ষেত্রে মূল বেতন এর চাইতে কম। তাছাড়া পোশাক খাতে চাকরিতে ঢোকার জন্য কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতার দরকার হচ্ছে না। সে হিসাবে মজুরি বাড়ানোর দাবি যৌক্তিক হলেও ২৩ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিটি অযৌক্তিক।

এদিকে এবছর যুক্তরাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়া নকল পণ্য রপ্তানির অভিযোগ এনেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। বিজিএমইএ তাদের অধীনে থাকা কারখানা থেকে নকল পণ্য রপ্তানির এই অভিযোগ নাকচ করেছে। তাদের মতে, নকল তৈরি পোশাক রপ্তানি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য-প্রমাণ দেখাতে পারেনি অভিযোগকারী সংস্থাগুলো। তারা আরও জানায় ব্র্যান্ডগুলো থেকে নকল পণ্য রপ্তানির যে অভিযোগ করা হয়েছে সেগুলো আসলে অনুমান নির্ভর।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ও নকল তৈরি পোশাক রপ্তানির এই অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে। ত্রাা বলছেন, ২০১৮ সালে ঘোষিত নতুন মজুরি দেয়ার আগে

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ছিল ৫ হাজার ৩০০ টাকা। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া নতুন মজুরি সন্তোষজনক ছিল। বাংলাদেশ সরকার রপ্তানি আয় বাড়ানোর জন্য অটোমেশনের সাথে সামঞ্জস্য করতে আরএমজি সেক্টরকে সহায়তা করছে, বাংলাদেশ সরকার হিউম্যান-কম্পিউটার ইন্টারএকশ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করে ২০ লাখ আরএমজি কর্মীর জন্য প্রোগ্রাম চালু করেছে। দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির' মাধ্যমে ১৫ লাখ আরএমজি কর্মীর জন্য প্রোগ্রাম চালু করেছে। এই খাতে প্রত্যক্ষভাবে ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে সরকার।

তারা আরও জানান, ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ মিলিয়ে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। নারীদের কর্মসংস্থানের জন্যে তৈরি হয়েছে একটি বিশাল ক্ষেত্র। প্রত্যেকটি কারখানায় পেশাগত নিরাপত্তা কমিটি রয়েছে, যেখানে শ্রমিক ও কর্মচারীরা একসাথে কাজ করছে। বর্তমানে বিশ্বের ১০টি শীর্ষ স্থানীয় পরিবেশবান্ধব কারখানার মধ্যে ৮টিই এখন বাংলাদেশে। বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে লিড সনদ প্রাপ্ত ২০০ পোশাক ও বস্ত্র কারখানার মধ্যে ৭৩টি লিড প্লাটিনাম, ১১৩টি গোল্ড, ১০টি সিলভার ও ৪টি সার্টিফায়েড সনদ পেয়েছে। তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে পরিবেশবান্ধব কারখানার সংখ্যা ২০০-তে উন্নীত হয়েছে।

আর বিজিএমইএর নির্বাচিত একজন কর্মকর্তা বলছেন, নির্বাচনের আগে গার্মেন্টস সেক্টরকে অস্থিতিশীল করা, শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করা এবং বাংলাদেশি পণ্যের বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ তোলা একই চক্রের ষড়যন্ত্র। তারা চায় বৈদেশিক আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস তৈরি পোশাক খাতকে অস্থিতিশীল হোক। কারণ ষড়যন্ত্রীরা মনে করে গার্মেন্টস খাত অস্থিতিশীল হলে সরকার চাপে পড়বে।

---

# গণমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভিসানীতি অবমাননাকর

দেশের গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতে মার্কিন ভিসানীতি, যা দেশের

স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের সামিল বলে মনে করছেন সাংবাদিক নেতারা। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সমাবেশ থেকে এ মন্তব্য করা হয়। এসময় ভিসানীতির নামে স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ মানা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

জাস্টিস ফর জার্নালিস্ট আয়োজিত ভিসানীতির নামে সংবাদমাধ্যমে মার্কিন চাপের প্রতিবাদে সাংবাদিক সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা, ডিবিসি টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও দ্য ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী। সমাবেশে তিনি বলেন, ‘একটি স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভিসানীতি অবমাননাকর। দেশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের সামিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ চলে সংবিধানের ওপর। একটি স্বাধীন দেশের ওপর বাইরের দেশের হস্তক্ষেপ মানি না মানবো না। আমেরিকা বন্ধুর আচরণের বিপরীতে প্রভুর আচরণ করতে চায়। আমরা সেটি মানবো না। তারা ভিসানীতির ভয় দেখিয়ে অযাচিত হুমকি দেবেন, সেটা মেনে নিতে পারি না। বাঙালি জাতিকে ভিসানীতি বা স্যাংশনের ভয় দেখিয়ে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়াবো। নিজের শক্তি দিয়ে গণতান্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই।’

জাস্টিস ফর জার্নালিস্ট সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ওবায়দুল হক খানের সভাপতিত্বে এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাবেক মহাসচিব আবদুল জলিল ভূঁইয়া, ডিইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মানিক লাল ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সংগঠনের সভাপতি কামরুল ইসলাম, সদস্য সচিব সাহিন বাবু, সিনিয়র সাংবাদিক লায়েকুজ্জামান, আবু সাঈদ প্রমুখ।

এসময় মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, ভিসানীতি নিয়ে আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন নই। আমেরিকা বছরে ভিসা দেয় মাত্র ২৭ হাজার। এতে সারাদেশে মানুষের কি সমস্যা। ভিসানীতি তো তাদের আছেই, প্রতি বছর ১ লাখ আবেদন করে আর ভিসা দেয় ২৭ হাজার।

তিনি আরও বলেন, ‘আমেরিকার গণমাধ্যম স্বাধীন। সেখানে পিটার হাস এ কথা বলতে পারেন না। অথচ বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর ভিসানীতির কথা বলছেন পিটার হাস। এটা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর একটি চাপ সৃষ্টি করা। ভিসাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায় পিটার হাস আপনি

অতিথি মানুষ। তাই আপনার নীতির মধ্যে থাকুন। বাংলাদেশের স্বাধীন গণমাধ্যম কোনো আত্মসমর্পণ করে না। করবে না।’

আবদুল জলিল ভূঁইয়া বলেন, ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথা উঠলেই একাত্তর সালের কথা মনে পড়ে। খুনিদের সরদার আমেরিকা। ডিইউজের যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম বলেন, আমার দেশ আমার। তুমি মার্কিনি কথা বলার কে।’

এসময় অন্য নেতারা বলেন, ‘আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কিভাবে কলুষিত করা যায়, সেই চেষ্টা করছে। আমেরিকা ভিসানীতি দিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। বাঙালি জাতিকে ভয় দেখানো সহজ নয়।’ গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান তারা।

অক্টোবরে ফয়সালার নামে বিএনপি কী করতে চায়?

গত বছরের ১০ ডিসেম্বর বর্তমান সরকারের পতন ঘটবে, আর বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার কথায় দেশ চলবে এমন গুজব ছড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব ছিল দলটি। সাধারণ মানুষের মনেও অজানা আতঙ্ক বিরাজ করেছিল- কী যেন হয় ১০ ডিসেম্বর। আবারও সেই পথে হাঁটছে সেনা ছাউনি থেকে থেকে জন্ম নেওয়া দলটি। এবার তারা এমাসেই অর্থাৎ অক্টোবরেই বর্তমান সরকারের পতন ঘটবে বলে দেশবাসীকে বিশ্বাস করাতে চাইছে।

নভেম্বরের শুরুতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর আগেই চূড়ান্ত আন্দোলনে দফারফায় পৌঁছাতে চায় বিএনপি। এজন্য অক্টোবরে রাজপথেই ফয়সালা করতে চায় বিএনপি, এবং সেটা রাজপথেই। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, ফয়সালা বলতে আদতে কি চায় বিএনপি?

কয়েক সপ্তাহ ধরে বর্তমান সরকার পতনের একদফা দাবিতে সরব হয় বিএনপি। কিন্তু এর মাঝে খালেদা জিয়ার মুক্তি, তত্ত্বাবধায়ক

সরকার, সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিসহ বিভিন্ন দাবিতে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করছে। দাবি ও দফার ক্ষেত্রে বিএনপ স্পষ্ট করতে পারেনি যে তাদের দফা আসলে কয়টি। কখনও ৩১ দফা, কখনও ১০ দফা, এরপর এখন একদফার আন্দোলনেও একই অবস্থা। সর্বশেষ দলীয় প্রধান খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করার ষড়যন্ত্রে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছিল গত ২৪ সেপ্টেম্বর। ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও বিএনপি কিছুই করতে পারেনি। আল্টিমেটাম শেষ হওয়ার পর দলের মহাসচিব আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন বলেছিলেন। অর্থাৎ, আল্টিমেটামের মধ্যে কাজ না হলে কি করা হবে সেই সিদ্ধান্তই তাদের ছিলনা। ফলে কোনো আন্দোলনেই জনসম্পৃক্ততা পায়নি দলটি। সিদ্ধান্তহীনতা, নেতাকর্মীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব, সমন্বয়হীনতার কারণে কোনো আন্দোলনেই যেমন দৃশ্যমান সফলতা আসেনি। তেমনি বারবার দলের নেতাকর্মীদেরকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়েছে।

২০১১ সালে খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে ঈদের পরে তীব্র আন্দোলন হবে, সে বছর ঈদ এসেছিল ঠিকই কিন্তু জনসমর্থন না পেয়ে আন্দোলন করতে পারেনি বিএনপি। একইভাবে ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ সালেও ঈদের পরে তীব্র আন্দোলন ঘোষণা করেছিলেন খালেদা জিয়া। প্রতিবছর ঈদ এলেও খালেদা জিয়ার সেই আন্দোলন আর আসেনি। বিএনপি নেতা আমানউল্লাহ আমান ২০২২ সালে ঘোষণা করেছিলেন ১০ ডিসেম্বরের পর খালেদা জিয়ার কথায় দেশ চলবে। গেল ১০ ডিসেম্বর, কিন্তু ঈদের পর আন্দোলনের মতোই আবারও শুভংকরের ফাঁকি দিলো বিএনপির আন্দোলন।

বিএনপির চলমান কর্মসূচি শেষ হবে ৫ অক্টোবর। এরপর পরবর্তী ধাপের আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হবে। তাদের পরিকল্পনা সেই আন্দোলন ২০ তারিখ পর্যন্ত চালানোর পর ২৪ তারিখের থেকে চূড়ান্ত কর্মসূচি দেওয়া হবে। দলটির এমন বিশ্রাম-বিরতি দিয়ে আন্দোলন করার প্রবণতায় বেজায় নাখোজ তৃণমূলের নেতাকর্মীরা।
এজন্য দলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নেতা আন্দোলনে নিষ্ক্রিয়তা দেখাচ্ছেন, যারা সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন তাদের মাঝেও উৎসাহের অভাব দেখা যাচ্ছে। অনেককেই তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিতেও দেখা যাচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জানান, দলটির নেতা কে? প্রতি মুহূর্তে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছ থেকে। চেয়ারপারসেন খালেদা জিয়া বর্তমানে সাজাপ্রাপ্ত আসামি এবং শারীরিকভাবে রাজনীতি করতে অক্ষম।

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও ফেরারি আসামি হয়ে দেশের বাইরে। মহাসচিবসহ অন্য নেতারাও ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেন। একারণে আন্দোলন কর্মসূচিতে ঠিকমতো সমন্বয় হচ্ছে না। এই সুযোগটি নিচ্ছে সরকারি দল।

বিএনপি নেতাদের মধ্যে কোনো সমন্বয়হীনতা নেই বলে দাবি করেছেন দলটির মহাসচি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার পতনের আন্দোলনে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই লড়াইয়ে সবাইকে থাকতে হবে এবং এই সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের র্যা বের ওপর স্যাংশন এবং ভিসানীতির কারণে সরকার কিছুটা চাপে আছে বলে মনে করে বিএনপি। এজন্য মাঠের আন্দোলনের চেয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপে দিকে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা অপেক্ষায় আছে বিএনপি নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার মনে করেন, বিএনপি বিগত এক বছর ধরে যে আন্দোলন চালিয়ে আসছে তাতে তাদের দাবি আদায় বা লক্ষ্য পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেন, ‘বিএনপি বিদেশি চাপের কথা বলে ও ষড়যন্ত্র করে যে চাপ দিতে চাইছে তাতে আওয়ামী লীগ বিচলিত নয়। এ অবস্থায় যদি সমঝোতার কথা সামনে আসে, তাহলে প্রশ্ন হলো, সমঝোতা হবে কোন বিষয়ে?, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি উচ্চ আদালতের আদেশে বাতিল হয়েছে। অর্থাৎ, ২০১৮ সালের মতো বিদ্যমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ছাড়া কোনো সমঝোতার পথ বিএনপির সামনে খোলা নেই।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায় বলেন, ‘সব বিষয়ে জনসমর্থন হারিয়ে দিশেহারা বিএনপি আন্দোলনের নামে খালি কলশি বাজিয়ে যাচ্ছে। নিজের ঘর গুছিয়ে নির্বাচনে যাওয়ার মতো প্রস্তুতি দলটির নেই। প্রধান বিরোধীদল হিসেবে দাবি করলেও এখন দলটির অবস্থান অত্যন্ত নড়বরে। অক্টোবরেই ফয়সালা করার মতো সক্ষমতা দলটির নেই। যেকোনো উপায়ে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে দলটি।’

বাংলাদেশ অগ্রযাত্রার গৌরবগাথা শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনাল

চোখ ধাঁধানো দৃষ্টিনন্দন সব কাজ। স্বচ্ছ গ্লাসে মোড়ানো পুরো ভবন। যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশের অবারিত সুযোগ। ভিতরের চিত্রটা আরও দৃষ্টিনন্দন। ছাদের দিকে তাকালে যাত্রীদের চোখ এক নিমিষেই হারিয়ে যাবে সেই দিকটায়। বিশাল পরিসর। যাত্রীদের মন জয় করার মত এক স্থাপনা। সেখানে প্রবেশ করলে সবার অনুভূতিই বদলে যাবে। বাইরে থেকেও মানুষের নজর কাড়বে- এমন অপররূপ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত স্থাপনা- হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল। যেখানে ঝক্কিঝামেলা ছাড়াই যাত্রীরা অবাদে যাতায়াত করতে পারবেন।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সূত্র জানা গেছে, শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন পায় ২০১৭ সালের ২৪ অক্টোবর। সে সময় ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৩ হাজার ৬১০ কোটি টাকা। পরে আরও ৭ হাজার ৭৮৮ কোটি ৫৯ লাখ টাকা বাড়িয়ে প্রকল্পের আকার দাঁড়ায় প্রায় ২১ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাপানি সহযোগিতা সংস্থা জাইকা ঋণ হিসেবে দিচ্ছে ১৬ হাজার ১৪১ কোটি ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। বাকি ৫ হাজার ২৫৮ কোটি ৩ লাখ ৮৮ হাজার টাকা দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে থার্ড টার্মিনাল প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দরের আদলে নির্মাণ হচ্ছে শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনাল। কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০২৪ সালের এপ্রিলের মধ্যে। ঢাকা কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে জাপানের মিত্সুবিশি ও ফুজিটা এবং কোরিয়ার স্যামসাং- এই তিন প্রতিষ্ঠান মিলে থার্ড টার্মিনাল নির্মাণ করছে।

প্রকল্পে কিছু খাতে টাকা সাশ্রয় হয়েছে। সাশ্রয়কৃত এই টাকা দিয়ে সরকার ও জাইকার সম্মতি এবং অন্যান্য বিধিগত প্রক্রিয়া নিষ্পত্তিসাপেক্ষে তৃতীয় টার্মিনালে ১২টি বোর্ডিং ব্রিজের জায়গায় অতিরিক্ত আরও ১৪টি বোর্ডিং ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ বোডিং ব্রিজের মোট সংখ্যা এখন ২৬ টি।

তৃতীয় টার্মিনালের আয়তন হচ্ছে দুই লাখ ৩০ হাজার বর্গমিটার। থার্ড টার্মিনালে মোট ৩৭টি অ্যাপ্রোন পার্কিং থাকছে। ফলে একসঙ্গে ৩৭টি উড়োজাহাজ পার্ক করা যাবে। শাহজালাল বিমানবন্দরে বর্তমানে ট্যাক্সিওয়ে আছে চারটি। নতুন করে আরও দুটি হাই স্পিড ট্যাক্সিওয়ে যোগ হচ্ছে। রানওয়েতে উড়োজাহাজকে যাতে বেশি সময় থাকতে না হয়, সেজন্য তৈরি করা হচ্ছে নতুন দুটি ট্যাক্সিওয়ে। এছাড়া পণ্য আমদানি ও রপ্তানির জন্য দুটি ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। আরও থাকবে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য তিনতলা ভবন।

বেবিচকের তথ্যানুযায়ী, থার্ড টার্মিনালে ২৬টি বোর্ডিং ব্রিজের মধ্যে প্রথম ধাপে চালু করা হবে ১২টি। ৫ লাখ ৪২ হাজার বর্গমিটার এলাকায় ৩৭টি উড়োজাহাজ পার্ক করা যাবে। বহির্গমনের জন্য ১৫টি সেলফ সার্ভিস চেকইন কাউন্টারসহ মোট ১১৫টি চেকইন কাউন্টার থাকবে। এছাড়া ১০টি স্বয়ংক্রিয় পাসপোর্ট কন্ট্রোল কাউন্টারসহ থাকবে ৬৬টি ডিপারচার ইমিগ্রেশন কাউন্টার। আগমনের ক্ষেত্রে পাঁচটি স্বয়ংক্রিয় চেকইন কাউন্টারসহ মোট ৫৯টি পাসপোর্ট ও ১৯টি চেকইন অ্যারাইভাল কাউন্টার থাকবে। থাকবে ১৬টি ব্যাগেজ বেল্ট। গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য থার্ড টার্মিনালের সঙ্গে মাল্টিলেভেল কার পার্কিং ভবন নির্মাণ করা হবে। যেখানে এক হাজার ৩৫০টি গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে।

বহুরকম সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন থার্ড টার্মিনালে প্রবেশ ও বাহিরের ক্ষেত্রে থাকবে না কোনরকম ঝক্কিঝামেলা। সহজেই বিমানবন্দরে ঢুকা যাবে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একটি লুপ থার্ড টার্মিনালের সঙ্গে যুক্ত হবে। থাকবে মেট্রোরেলের সংযোগও। হাজি ক্যাম্পের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য থাকবে টানেল। টানেলটি বিমানবন্দরের অদূরে অবস্থিত মেট্রোরেলের স্টেশনের সঙ্গেও। ফলে বিদেশ থেকে যেসব যাত্রী আসবেন তারা খুব সহজেই বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারবেন। আবার যারা বিদেশ যাবেন, তারাও রাজধানীর যানজট এড়িয়ে খুব সহজে বিমানবন্দরে যেতে পারবেন।

বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পের এক অনন্য স্থাপনা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন হচ্ছে আগামী ৭ অক্টোবর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই ভবনটি উদ্বোধন করবেন। সোমবার (২অক্টোবর) ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক থার্ড টার্মিনালে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান জানিয়েছেন, বিমানবন্দরের নির্মাণাধীন তৃতীয় টার্মিনালের

কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘মন্ত্রণালয়সহ সবার সহযোগিতায় করোনাভাইরাসের মহামারীর সময়েও আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে তৃতীয় টার্মিনালের কাজ চলমান রাখতে পেরেছিলাম। আমাদের শ্রমিকদের মনোবল অনেক কঠোর ছিল। করোনা মহামারী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট আসা বন্ধ হয়ে গেয়েছিল। গুণগত মান বজায় রেখে সেসব ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এগুলো আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল। তারপরও আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে গেছি। এর ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই আমরা প্রকল্প উদ্বোধন করতে যাচ্ছি।’

অক্টোবর নিয়ে ভয় তৈরি করছে বিএনপি

অক্টোবরে বিএনপি কী করবে বা কী করতে পারবে—এখন এই প্রশ্নেই আলোচনা ঘুরপাক খাচ্ছে বিভিন্ন মহলে। দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতা জানিয়েছেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আন্দোলনের পরিণতি দেখতে চায় তারা। এমন চিন্তা থেকে যুগপৎ আন্দোলনকে অক্টোবরের মধ্যেই চূড়ান্ত ধাপে নিতে কৌশল ঠিক করছে দলটি। বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে ইতোমধ্যে এমন বার্তা দেওয়া হয়েছে সারা দেশে দলের নেতা–কর্মীদের।

কী হবে অক্টোবরে সে নিয়ে শঙ্কায় আছে মানুষ। সরকার এবার বিনা চ্যালেঞ্জে একতরফা নির্বাচনের দিকে যাতে এগোতে না পারে, সে ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব হবে বলে বিএনপির নেতা–কর্মীদের বড় অংশ মনে করছে। সাধারণ মানুষ ভাবছে এই যদি হয় পরিকল্পনা, তাহলে আবার সন্ত্রাস শুরু হতে পারে। বিএনপি-জামায়াতের আগুন সন্ত্রাসের কথা দেশবাসী ভুলে যায়নি। কীভাবে সাধারণ জনগণকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল, সবাই মনে রেখেছে। ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করার জন্য বিএনপি-জামায়াত চক্র জ্বালাও-পোড়াও শুরু করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য যখন বিচার

শুরু হয় তখনই এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি শুরু হয়। সে সময় ৪১৯টি ঘটনায় ১৫ জন পুলিশ সদস্যসহ নিহত হয় ৪৯২ জন, আহত হয় আড়াই হাজারের কাছাকাছি।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের বিরোধিতা করে বিএনপি জোটের ভয়াবহ সন্ত্রাসের কথা কেউ ভোলেনি। তখন শত শতযানবাহন পুড়িয়ে দেয়া হয়। পেট্রোল বোমার আঘাতে দগ্ধ মানুষের আহাজারিতে ভরে যায় ঢাকার আকাশ বাতাস। তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি লাখ লাখ গাছও। নির্বাচনের দিন প্রিসাইডিং অফিসারসহ হত্যা করা হয় ২৬ জন নিরীহ মানুষকে। সারাদেশে ৫৮২টি ভোটকেন্দ্রে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

এসব বাধা অতিক্রম করে সেদিন জনগণ গণতন্ত্রকে বিজয়ী করেছিল। ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি সরকারের এক বছর পূর্তির দিনও বিএনপি জামায়াত চক্র আবার জ্বালাও-পোড়াও করে বাস, ট্রেন, লঞ্চ, সরকারি স্থাপনাগুলোতে পেট্রোল বোমা মেরে সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। ওই সময় ২৩১ জনকে হত্যা করা হয়। প্রায় ১২শ লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়। ২ হাজার ৯০৩টি বাস-ট্রাক, ১৮টি ট্রেন, আটটি যাত্রীবাহী লঞ্চ, সাতটি ভূমি অফিসসহ ৭০টি সরকারি অফিসে আগুন দেয়।

জনগণের শঙ্কা সেই দিন আবারও ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনায় মত্ত এই দলটি। বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা সাইফুল হক বলেন, দেশ এখন উন্নয়নের পথে এসেছে। আমরা গত দুই বছরে পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দেখেছি। কোনো একটা রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে এই ধারাবাহিকতা নষ্ট হোক তা আমরা চাই না।

উন্নয়নকর্মী রেজাউল করীম মনে করেন এখন জনগণ কোনো জ্বালাও পোড়াও সহ্য করবে না। তিনি বলেন, ‘কোভিডের পরে আমরা সবাই নানা সংকটে আছি। অর্থের যোগান নানা ভাবে কমেছে। এসবের মধ্যে সরকার সিদ্ধহস্তে সব সামলে নিতে চেষ্টা করছে। এখন কোনো ধরনের আভ্যন্তরীণ সংকট ঘটলে মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। বিএনপি অক্টোবরে আন্দোলনের ভয় দেখানোর কারণে অমাদের নানা সামাজিক কর্মসূচি আমরা স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছি। তবে আগের মতো জ্বালাও পোড়াও করে জনগণের সমর্থন আদায় করতে পারবে না এটা দলটিকে মেনে নিতে হবে।’

উল্লেখ্য, ঢাকায় বড় জমায়েতের মহাসমাবেশ করার পরদিনই গত ২৯ জুলাই রাজধানীর প্রবেশমুখে অবস্থান কর্মসূচিতে বিএনপির নেতা–কর্মীদের জমায়েত সেভাবে ছিল না। সেই পরিস্থিতি ছিল তাঁদের জন্য একটা বড়

ধাক্কা। এরপর আগস্টে আবার দুই দফায় গণমিছিল–পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করে এক দফার যুগপৎ আন্দোলনে ফিরেছে বিএনপি। এখন দলটি অক্টোবর মাসের মধ্যে তাদের আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিতে চাইছে।

শিশু হত্যা করছে বিএনপি, রক্ষা করছেন শেখ হাসিনা

চট্টগ্রাসের মিরসরাইয়ের আজমপুর বাজারে তাণ্ডব করছিল বিএনপি কর্মীরা। এরই ছবি তুলছিল জাহেদ। আজকাল সবাই যেমন তোলে। রুমনের মামা ইউনুস নূরী জানান, তখন ছবি তোলার অপরাধে বিএনপি নেতাকর্মীরা ধাওয়া করে রুমনকে। সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। একসময় তাঁরা তাকে মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে বিএনপির এক কর্মী। এতে সে পাশের পুকুরে পড়ে যায়। এরপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক খন্দকার নোমান সায়েরী্ও জানান, মাথায় আঘাতজনিত কারণে রুমনের মৃত্যু হয়েছে।

এই মৃত্যু নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। রুমন কোন দলের কর্মী। আদৌ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কী না। আরও নিশ্চই হবে। কিন্তু তাতে এখন মৃত রুমনের কিছু যায় আসে না। যায় আসে তার পরিবারের। বাবাহীন এই কিশোর মা নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলেন ছেলেটি বড় হবে, তাঁর দুঃখ ঘোচাবে। কিন্তু সেই স্বপ আজ অতীত। যেরকম ভাবে ২০১৩-১৪ সালে অতীত হয়েছিল আরও বহু পরিবারের স্বপ্ন ।

আমরা যদি একটু পেছনে তাকাই তাহলে দেখবো, সন্ত্রাস করে এরকম রুমনের মত শিশু কিশোরদের ভবিষ্যত নষ্ট করা গল্প বিএনপির ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। পেট্রোল বোমা ও ককটেল ছোড়ার যে অপরাজনীতি তা বিগত কয়েকটি নির্বাচনের আগে আমরা দেখেছি। তাদের উদ্দেশ্য যেভাবে হোক ক্ষমতা দখল করতে হবে। সেনাছাউনি থেকে উঠে আসা একটি দল। তাদের কাছ থেকে দেশের মানুষ এর চেয়ে বেশি আর কি বা আশা করতে পারে। আমরা বিএনপির রাজনীতিতে শিশু হত্যার যে নারকীয় ইতিহাস

সেখানে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারি।

২০০২ সালের ৯ মে রামপুরায় বাবার কোলে থাকা ২০ মাসের শিশু নওশিন ছিনতাইকারীদের গুলিতে নিহত হবার পর শোকার্ত পরিবারের প্রতি চারদলীয় জোট সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছিলেন, “আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে”। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি বিএনপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ ধরনের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বোঝা যায়, শিশু-কিশোরদের প্রতি তাদের অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে সমর্থন করায় ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার চরমোতাহা গ্রামের মোর্শেদ আলীর চার মাসের বাচ্চাকে মায়ের কোল থেকে ফেলে দিয়ে থেঁতলে হত্যা করেছিল বিএনপির নেতা-কর্মীরা। চার মাসের বাচ্চাকে হত্যা করার পরেও তারা মোর্শদের স্ত্রীকে সারা রাত ধর্ষণ করে।

২০০২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার পোয়ালগুরা দড়িপাড়া গ্রামের এতিম কিশোরীকে ধর্ষণ করে ইউনিয়ন বিএনপির এক নেতা। রাজশাহীর বাগমারায় ২০০২ সালের ২১ মার্চ ৭ বছরের এক শিশুকে তুলে নিয়ে যায় সরকার সমর্থক পাঁচ সন্ত্রাসী। গণধর্ষণ করা হয় ৭ বছরের ওই শিশুকে। একই বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি স্কুল ছাত্র শিহাবকে অপহরণ করা হয়। তার বাবার কাছে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। টাকা দেয়ার আগেই শিহাবকে ১২ টুকরো করে হত্যা করা হয়।

২০০১-২০০৬ সালের বিএনপির শাসনামলে সংবাদপত্রের তথ্যানুযায়ী, শিশু-কিশোরদের ককটেল বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ২০১৩ সালের তাদের অগ্নি-সন্ত্রাসের বড়ো হাতিয়ার ছিল এসব শিশু- কিশোররা । তাদের টাকার বিনিময়ে এসব কাজ করানো হতো। ২০১৩-১৫ সাল অব্দি চলমান আগুন সন্ত্রাসে গ্রেফতার অনেকেই ছিল কিশোর। তারা পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়ে স্বীকার করেছে যে, টাকার বিনিময়ে বিএনপির নির্দেশে এবং তাদের সরবরাহকরা পেট্রোল বোমা দিয়ে তারা এ সন্ত্রাস করেছে।

এই শিশু-কিশোরদ সুরক্ষা দিতে কাজ শুরু করে বর্মান সরকার। শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রথমেই জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ প্রণয়ন করে। বাংলাদেশে শিশু অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আইনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ নীতিতে শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী এবং কিশোর বলতে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের ধরা হয়।

সরকার কাজ করছে শিশুর নিরাপদ জন্ম ও সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণ,

শিশুর দারিদ্র বিমোচন, শিশু স্বাস্থ্য, শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, শিশুর বিনোদন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিশুর সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম, অটিস্টিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম, শিশুর জন্ম নিবন্ধন, অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম, দুর্যোগের সময় ও দুর্যোগের পরে শিশুর সুরক্ষা, শিশুর অংশগ্রহণ ও শিশু মতামত গ্রহণসহ শিশু অধিকার বাস্তবায়ন নিয়ে।

কন্যা শিশুদের অগ্রাধিকার দিয়েছে শেখ হাসিনা সরকার । ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালন করছে সরকার। এবছরও ‘বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার’-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে দেশব্যাপী উদযাপিত হয়েছে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৩। কন্যাশিশুদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন করে শেখ হাসিনা সরকার। মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীর ক্ষমতায়নের দুটি মূল উপাদান-হিসেবে চিহ্নিত করে নারী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে এবং নারী শিক্ষার ক্রমবর্ধমান হারের ফলে বাল্যবিবাহের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগের শাসনামলেই এদেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল, যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের পরিমাণ ২ লাখ ৬১ হাজার ৭ শত ৮৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৩৪ দশমিক ৩৭ শতাংশ এবং জিডিপি’র ৫ দশমিক ২৩ শতাংশ। বাজেটে ২৭টি মন্ত্রণালয় ও ১৭টি বিভাগের জন্য পৃথক জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়। যা নারী ও কন্যাশিশুদের সার্বিক অধিকার রক্ষায় ব্যবহৃত হবে।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রণীত উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ২৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন উপবৃত্তি এবং বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। উপবৃত্তির অর্থ সরাসরি তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মা অথবা বৈধ অভিভাবকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৭৪,৮২,৩১,৭০০ টাকা সরকার উপবৃত্তি দিয়েছে। নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ আওয়ামী লীগের আমলেই গৃহীত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় এখন শিক্ষক পদের ৬০ শতাংশ নারীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সরকারি চাকরিতে নারীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রয়েছে।

কন্যা শিশুর অগ্রাধিকারমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করে আওয়ামী লীগ সরকার। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধিত) আইন-২০২০ এবং যুগোপযোগী বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাল্যবিবাহ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ক্রীড়াঙ্গনেও আমাদের মেয়েরা ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছে।

ব্রিকস সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক মধ্যাহ্নভোজে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অঞ্চলের নারী ও বালিকাদের ‘পরিবর্তনের কারিগর’ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এসডিজির পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি গ্লোবাল সাউথ নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের নারীবান্ধব শিক্ষানীতির কারণে দেশে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের তালিকাভুক্তি বেড়েছে ৯৯ শতাংশ। মেয়ে-ছেলে স্কুলে তালিকাভুক্তির অনুপাত ৫৩:৪৭-এ উন্নীত হয়েছে।

আয়ামী লীগ সরকারের শাসনামল মূল্যায়ন করে আজ একথা অন্তত বলা যায় যে তারা ক্ষমতায় থাকুক কিংবা না থাকুক তাদের কাছে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে। কারণ আজ পর্ন্ত এই সরকারের বিরুদ্ধে শিশু কিশোর বিরোধী কোন পদক্ষপের তথ্য তাদের বিরোধী পক্ষের কাছেও নেই।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

খালেদা জিয়ার বিদেশে যাওয়ার

আবেদনে আইন মন্ত্রণালয়ের ‘না’

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেশে যাওয়ার আবেদন নাকচ করে দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। রোববার (১ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি জানানো হয়। মন্ত্রণালয় বলছে, ‘বিদেশে যেতে হলে আগে জেলে গিয়ে আদালতে আবেদন করতে হবে।’

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আইনমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের কাছে আইনি মতামতের জন্য খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে আবেদন এসেছে। আমরা সেটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।’

প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্য প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘৪০১ ধারা অনুযায়ী যদি কোনো সরকার নির্বাহী আদেশ দেন, তবে সেটা আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। সেক্ষেত্রে তাকে আবার জেলে যেতে হবে। তারপর আদালতে আবেদন করতে হবে।’

একই দিন দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন, সেটা হলো আইনের অবস্থান। আমি মনে করি সেটা সঠিক। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন যে খালেদা জিয়ার আগে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার ক্ষমতাবলে সাজা স্থগিত করেছেন ও শর্তযুক্তভাবে প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতার কারণে তাকে মুক্তি দিয়েছেন। এটা এখন পাস্ট অ্যান্ড ক্লোজ ট্রানজেকশন। এখন এটা ওপেন করার কোনো উপায় নাই আইনগতভাবে। এটা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। সেটাই আইনের অবস্থানই।’

এর আগে নিউ ইয়র্ক সফরকালীন ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছিলেন, ‘বিদেশে চিকিৎসা নিতে হলে আগে তাকে (খালেদা জিয়া) আবার জেলে যেতে হবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের উৎসে কোনো কর দিতে হবে না: আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ফ্রিল্যান্সারদের আয়ের ওপর কোনো উৎসে কর দিতে হবে না। তথ্যটি স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকার একটি হোটেলে ফেলিসিটি ইন্টারনেট ডাটা সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত ‘বিএফএসআই ক্লাউড এবং সাইবার সিকিউরিটি’ শীর্ষক নলেজ শেয়ারিং অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদের আশ্বস্ত করে বলেন, তাদেরকে কোনো উৎসে কর দিতে হবে না। তারা ট্যাক্সের আওতার বাইরে।

গত কয়েকদিন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছিলো যে, দেশের ফ্রিল্যান্সারদের বৈদেশিক আয়ের ওপর ১০% কর দিতে হবে। এমন খবর ছড়িয়ে পড়ায় ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য আসতে শুরু করে। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বিভিন্ন মহলে গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে, ফ্রিল্যান্সারদের কর দিতে হবে। এটা করে একটি চক্র বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘গত ১৪ বছরে প্রযুক্তিবান্ধব আওয়ামী লীগ সরকার ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরের উন্নয়ন ও বিকাশে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে অনুদান প্রদান, তাদের আইডিসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।’

বিভ্রান্তিটি তৈরি করা হয় গত ২৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত ‘আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১২৪ ধারা (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 52Q) অনুযায়ী সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের উপর উৎসে কর কর্তন ও জমাদান প্রসঙ্গে’ ইস্যুকৃত একটি প্রজ্ঞাপন থেকে। তাতে বলা হয়, নতুন আয়কর আইন অনুসারে সকল উৎসকর নির্ধারিত কোডের অনুকূলে জমা দিতে হবে। এই প্রজ্ঞাপনে কোথাও ফ্রিল্যান্সারদের ১০% উৎসকর

দেওয়ার কথা বলা নেই।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই প্রজ্ঞাপনের সংযুক্তি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর অঞ্চল-১১ এর ১২ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে ফি, সেবা চার্জ বা পারিশ্রমিক বা প্রকৃতির রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ কোনো ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ বা জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপকের হিসাবে অর্থ পরিশোধ বা জমা প্রদানকালে উক্ত পরিশোধিত বা জমাকৃত অর্থের ওপর ১০% হারে কর কর্তন করার কথা উল্লেখ থাকায় এই বিভ্রান্তি তৈরি হয়। প্রকৃত পক্ষে, বিদেশ থেকে অর্জিত অর্থে কর আছে বটে, তবে তা ফ্রিল্যান্সারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর পরিদর্শক শাদনান মাহমুদ জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনটি একদমই রুটিন প্রজ্ঞাপন। প্রজ্ঞাপনের কারণ হল সেবা খাত, রেভিনিউ শেয়ারিং খাত এইসব খাত থেকে বিদেশ থেকে যে আয় আসে, সেই আয়ের উপর যে কর তা আগে বিভিন্ন কর অঞ্চলে জমা দিতে হতো। নতুন আয়কর আইন আসার পর সরকার নিয়ম করেছে যে, এই খাতের কর বিভিন্ন কর অঞ্চলে জমা না দিয়ে মাত্র একটা কর অঞ্চলের কোডে জমা দেয়া লাগবে। ওই কর অঞ্চল ঢাকা-১১ সেটিই একটা চিঠি দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে মনে করিয়ে দিয়েছে। এর বেশি আর কোন কথা চিঠিতেও লেখা নেই।।

২০১৮ সালে Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) এর সংশোধন করে ফ্রিল্যান্সারদের ওপর কর প্রত্যাহার করা হয়। আয়কর আইনে ফ্রিল্যান্সারদের কর দেওয়ার বিষয়টি বাতিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

করোনা ভাইরাস সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারিতে প্রতিটি দেশের অর্থনীতি ও জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সাথে সৃষ্টি হয়েছিল ভয়, সংক্রমণ ও

মৃত্যুর সুদীর্ঘ তালিকা। দুই বছরের মত মানুষ ছিল ঘরের মধ্যে বন্দি। ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে আরও ভয়াবহ ও দীর্ঘ হয়েছিল প্রতিটি দিন প্রতিটি ক্ষণ।

যখন বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ উন্নত বিশ্বে আবিস্কৃত প্রতিষেধক তাদের নিজেদেরকে সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কিনতে ও ব্যবহার করতে পারছে না। তখন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বলিষ্ট ভূমিকা রেখে (আবিস্কৃত টিকার মেধাস্বত্ববিহীন করার প্রস্তাব দিয়ে অনুমোদন করিয়ে ) সেই বৈশ্বিক মহামারি থেকে বাংলাদেশের মানুষদেরকে বাঁচানোর জন্য সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন দেশের আটটি ভ্যাক্সিন।

যেখানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল , কয়েক লক্ষ মানুষ মারা যেতে পারে বাংলাদেশে। সেই টিকা কিনে বিনা মূল্যে প্রয়োগ করে নিরাপদ স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করেছিলেন এবং বাঁচিয়েছিলেন লক্ষ মানুষকে প্রাণ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা দিয়ে অর্থনীতিকে করেছিলেন সচল। তিনি স্বাস্থ্য সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জাতীয় পরামর্শ কমিটি গঠন করেছিলেন এবং সেইসাথে অধিদপ্তর ভিত্তিক কিছু কমিটিও গঠিত হয় , যেখানে বিশেষজ্ঞ সদস্যরা সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে নিশ্চিত করেছিলেন মানুষের জীবনের সুরক্ষা। বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে সৃষ্টি করেছিল জনসচেতনতা।

তাঁর নির্দেশে তৈরি জাতীয় পরামর্শ কমিটি ও অধিদপ্তর ভিত্তিক কমিটিগুলো মহামারির শুরুতেই কোভিড রোগী সনাক্তকরণে ব্যবহৃত কিট , পিপিই , অক্সিজেন ও মেশিনপত্র আমদানিতে শুল্ক মওকুফ করে মানুষের ব্যবহারের সুবিধা করে দিয়েছিল। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অধীনে আমদানি অনুমোদন , তৈরি , সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করেছে সেই সময়ের জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় ওষুধসমূহের। যার ফলে স্বল্প ব্যয়ে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত সকল কোভিড রোগী সনাক্ত করা , আইসোলেশনে রাখা ও চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছিল।

প্রয়োজন অনুযায়ী কোভিড -১৯ রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা সুনিশ্চিত করতে নতুন নতুন বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ প্রক্রিয়ায় নতুন িচিৎসক , নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন। জটিল রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করার জন্য জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ শয্যার

ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেছিলেন। কোভিড রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিবেশী দেশ থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমদানিও করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, হাসপাতালে করোনা রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা যাতে ব্যঘাত না ঘটে সেজন্য চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ রাখতে তাদেরকে হোটেলে রেখে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বলিষ্ট নেতৃত্বে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে যে অবদান রেখেছিলেন তার সুফল পেয়েছিল বাংলাদেশ। অর্থনীতিকে রাখতে পেরেছিলেন সচল। তাঁর শক্তিশালী নেতৃত্ব ও সর্বক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ মনোভাব সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে উঠেছেন আস্থার ও ভরষার আশ্রয়স্থল।

লেখক: ডিন, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

এইতো এক যুগেরও আগের কথা, উন্নয়নের তলানিতে ডুবে ছিলো এই দেশ। লুটতরাজ ও দুর্নীতিবাজরা দেশে দুঃশাসন প্রতিষ্ঠা করে দেশকে পিছিয়ে নিতে তৎপর ছিলো। চেয়েছিলো অবৈধ পথে ক্ষমতায় বসতে কিন্তু ২০০৯ সালে জনগনের ভোটের রায়ে অশুভ শক্তির সকল অপচেষ্টা বিফলে যায়। সফল রাষ্ট্রনায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২য় মেয়াদে এই দেশের মানুষ অভিভাবকের আসনে বসান। সেই থেকে রচিত হতে থাকে উন্নয়নের মহাকাব্য।

সুপরিকল্পিতভাবে দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করতে থাকেন তিনি। গ্রাম থেকে শহর বাংলাদেশের সকল স্থানে উন্নয়নের ছোয়া লাগা শুরু হয়। দেশের মানুষকে এখন আর আদিম যুগের মতো পরনির্ভরশীল থাকতে হয় না। ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদেরকে

আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করেছে, প্রযুক্তি হয়েছে সহজলভ্য।

সকল উন্নয়ন ও প্রযুক্তির বিস্তারের পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের। ইতিমধ্যে এর সফল বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। সরকারের সদিচ্ছার ন্যায় দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ আমাদের সবার। দেশ স্মার্ট হলে এ জাতি স্মার্ট হবে। তাই সরকারকে সর্বোচ্চ সহযোগীতা করতে হবে সকলের।

স্মার্ট বাংলাদেশ হবে আমাদের সকলের একটি প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান যা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা। স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার চারটি ভিত্তি রয়েছে। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ। স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে এ চারটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে অগ্রসর হলে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের কোনো অবশিষ্ট থাকবে না। স্মার্ট নাগরিক ও স্মার্ট সরকার এর মাধ্যমে সব সেবা এবং মাধ্যম ডিজিটালে রূপান্তরিত হবে। আর স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করলে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

‘স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। এককথায় সব কাজই হবে স্মার্ট। যেমন স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট পরিবহন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট সংযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এক শিক্ষার্থী, এক ল্যাপটপ, এক স্বপ্নের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় সব ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নাম পরিবর্তন করে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স’ গঠন করেছে বাংলাদেশ সরকার। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স’ এর নয়টি কার্যপরিধিও সুস্পষ্ট করেছে সরকার যথা- ১. অগ্রসরমান তথ্যপ্রযুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান; ২। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান; ৩. স্মার্ট ও সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক

পরিমন্ডলে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিধি-বিধান প্রণয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান; ৪. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান; ৫. এজেন্সি ফর নলেজ অন এরানোটিক্যাল অ্যান্ড স্পেস হরাইজন (আকাশ) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান; ৬. ব্লেন্ডেড এডুকেশন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ফাইভজি সেবা চালু পরবর্তী সময়ে ব্যান্ডউইথের চাহিদা বিবেচনায় চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবলে সংযোগের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান; ৭. রপ্তানি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মেড ইন বাংলাদেশ পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দিক নির্দেশনা প্রদান; ৮. আর্থিক খাতের ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং ৯. স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ (স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট গর্ভমেন্ট) বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান।

স্মার্ট বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর করবে আওয়ামী লীগ সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং এর উন্নয়নে একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা হবে। সুতারং সরকার আগামী ২০৪১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আদর্শগত এমন রূপান্তর ঘটাবে যেখানে সকল সেবার ভিড়ে না হারিয়ে নাগরিকগণ নিজের প্রয়োজনীয় সেবা সহজে খুঁজে পাবেন; সেবা গ্রহিতার দায় নয় সেবা প্রদানকারীর দায়কে শক্তভাবে দেখা হবে; সরবরাহ কেন্দ্রিক থেকে চাহিদা কেন্দ্রিক সার্ভিসের যোগান হবে; নাগরিকগণকে এখন ডিজিটাল মাধ্যমেও নানান চ্যানেলে (অ্যাপ, ওয়েব, কল সেন্টার ইত্যাদি নানা প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে হয়) সেবা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশে একটি মাত্র প্লাটফর্ম থেকে নাগরিকগণ সকল চাহিত সেবা পাবেন। নানান পরিচয় নম্বরের (যেমন এনআইডি, পাসপোর্ট, জন্ম নিবন্ধন নম্বর ইত্যাদি) পরিবর্তে একটি পরিচয় নম্বর (ইউনিক আইডি) দিয়ে সকল কার্যক্রম সম্পাদন এবং সরকারি সেবা প্রদানকে দেখা হবে সেবা গ্রহিতার চোখে, সেবা দাতার চোখে নয়।

এক সময় টাকা নগদ তুলে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে জমা করতে হতো। কারণ, এক ব্যাংকের চেক অন্য ব্যাংক গ্রহণ করত না। পরে চেক

গ্রহণ করলেও সেই টাকা জমা হতে বেশ কয়েক দিন সময় লেগে যেত। আবার এক ব্যাংক থেকে বস্তা ভর্তি টাকা তুলে অন্য ব্যাংকে জমা করতেও দেখা যেত। অন্য কারও হিসাবে বা কাউকে টাকা পাঠাতে ব্যাংকে লাইন পড়ে যেত। আবার টাকা পাঠানোর জন্য কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসাও ছিল জমজমাট। কেনাকাটা ও লেনদেনের পুরোটাই হতো নগদ টাকায়। পরিসেবা বিল পরিশোধের জন্য ব্যাংকগুলোতে লাইন লেগে থাকত। মোবাইলে টাকা রিচার্জ করতেও প্রতিটি বাজার ও মহল্লায় ছিল একাধিক দোকান। নতুন প্রজন্মের কাছে এসব সাজানো গল্প মনে হতে পারে। তবে বাস্তবতা হলো আর্থিক লেনদেনে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে এসব এখন অনেক কিছুই ইতিহাসের অংশ।

ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডে কেনাকাটা, মোবাইলে আর্থিক সেবা (এমএফএস), ইন্টারনেট ব্যাংকিং, অ্যাপসে লেনদেন, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্টসহ এমন নানামুখী ডিজিটাল লেনদেন জীবনে এনে দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নগদ টাকা বহনের ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছে। জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। আর প্রতিটি লেনদেনে থাকছে ডিজিটাল রেকর্ড। যা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যাচ্ছে। এখন কার্ডের পরিবর্তে অ্যাপস,কিউআর কোড ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। মুঠোফোনই হয়ে উঠছে লেনদেনের বড় মাধ্যম। ব্যাংকগুলোর ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং বিকাশ, রকেট, নগদ, উপায়,মাই ক্যাশ,ট্যাপের মতো এমএফএসের কারণে সাধারণ মানুষ ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

স্মার্ট ইকোনমির অংশ হিসেবে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রবাস যাত্রা সহজ করতে এবং প্রবাসে যাওয়ার প্রস্তুতিমূলক কাগজপত্র ও সেবাসমূহ একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট থেকে প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে প্রবাসী হেল্প ডেস্ক চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এটুআই চালু করেছে ‘সাথী’ নামক একটি নেটওয়ার্ক। বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহযোগিতায় এটুআই প্রাথমিক পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টারের নারী উদ্যোক্তা নিয়ে এই নেটওয়ার্কের যাত্রা শুরু করেছে। দেশের সকল পরিষেবা বিল, শিক্ষা সংক্রান্ত ফি ও অন্যান্য সকল ধরনের সরকারি সেবার বিল প্রদানের পদ্ধতি সহজ ও সমন্বিতকরণে চালু হওয়া সমন্বিত পেমেন্ট প্ল্যাটফরম ‘একপে’-তে বিভিন্ন ধরনের করতে নতুন ৮টি আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নতুন পেমেন্ট চ্যানেল যুক্তকরণ।

সর্বোপরি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে।

লেখক:কোষাধ্যক্ষ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়